সর্বার্থে গান্ধীর গীতা ও রাজনীতি

দীপেশ চক্রবর্তী ও রোচনা মজুমদার
ভাষান্তর : সর্বাণী গুহ ঘোষাল ও চিরঞ্জীব শূর

গান্ধীর গীতাভাষ্য মূলত ১৯২৬ ও ১৯২৭ সালে সবরমতীতে আশ্রমিকদের কাছে প্রদত্ত কিছু বক্তৃতার সমাহার। এটি সম্ভবত ভারতীয় বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের একমাত্র নিদর্শন, যেখানে ভাগবৎ গীতার বক্তব্যকে অহিংস অসহযোগের তত্ত্বে রূপান্তরিত করা হয়। বর্তমান প্রবন্ধটিতে গান্ধীর গীতা পঠনকে বিশ শতকের সূচনাপর্বের কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ তথাকথিত 'চরমপন্থী' গোষ্ঠীর রাজনৈতিক চেতনার প্রেক্ষিতে আলোচনার দাবি রয়েছে। আমরা মনে করি, তৎকালীন চরমপন্থীদের কাছে অতিমাত্রায় রাজনৈতিকভাবে আদৃত গীতাকে গান্ধী সম্পূর্ণভাবে বিপরীত বিন্দুতে অবস্থিত অহিংস ধারার রাজনীতির এক মুখ্য হাতিয়ার করে তোলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য : ১৯২০-র পরবর্তী পর্যায়ে গীতা সংক্রান্ত প্রকরণের মধ্যে বাস্তব রাজনীতিকে গ্রহণের এক প্রয়াস লক্ষণীয় আর এইখানেই তিলক ও অরবিন্দের থেকে ভিন্ন তাঁর চিন্তা। গান্ধীর দৃষ্টিতে গীতা এক কবচকুন্ডল সদৃশ যা সত্যাগ্রহীকে তাঁর রাজনৈতিক কার্যাবলীর পথে অবশ্যম্ভাবী প্রলোভন ও হিংসার প্রতি আসক্তির মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দিতে সক্ষম।

১

আধুনিক রাজনীতির প্রকৃতির প্রশ্নে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক বা তিলক মহারাজ বা লোকমান্যের সঙ্গে গান্ধী আলোচনায় নামেন ১৯১৯-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত অমৃতসর কংগ্রেসের অব্যবহিত পরবর্তীকাল থেকেই। তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেন যে, তিলক এবং তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বলেন,

> লোকমান্য তিলক এক সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং এই বিষয়ে তাঁর কোনো গোপনীয়তা নেই। তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্যায্য বলে কিছু মানেন না। আমরাও রাজনৈতিক জীবনে যোগ দিয়েছিলাম তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেই। আমরা মনে করি এই দেশের রাজনৈতিক জীবন পুরোপুরিভাবে দুর্নীতি-আচ্ছাদিত হয়ে পড়বে যদি আমরা পশ্চিমী কৌশল ও প্রক্রিয়া আমদানী করি।

রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের পক্ষে "অন্যদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহৃত হতে কেউ থাকে" এমত ধারণার সমীচীনতার বিরোধিতা করে গান্ধী সেই উপায় অনুসরণ করার কথা বলেন, যার মাধ্যমে "সঠিক পন্থা" নেওয়া সম্ভব, যার লক্ষ্য হবে "রাজনীতির শুদ্ধিকরণ"।

তিলক রাজনৈতিক কর্ম সংক্রান্ত তাঁর নিজস্ব ধারণা সম্পর্কে গান্ধীর বিশ্লেষণে একমত হন না। তিনি বলেন, "আপনার মতে আমি মনে করি রাজনীতিতে অন্যায্য কিছু নয়, সেই

ক্ষেত্রে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমার মত যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়নি। আদতে আমি বলতে চাই, রাজনীতি বস্তুজগতের মানুষদের এক ক্রিয়া; সাধু, সর্বত্যাগীর নয়।" সাধু বলতে তিলক সম্ভবত বৌদ্ধ মত অনুসরণে সেই ব্যক্তিকে বোঝান যিনি ক্রোধকে জয় করেছেন। পক্ষান্তরে, তিলকের মতে রাজনীতির ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের নির্মিতিতে আস্থা রাখা ভালো, যিনি তাঁর বিভিন্ন ভক্তের কাছে বিভিন্নভাবে উপস্থিত, অথচ যা তাঁর নিজস্ব মূল দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। উপসংহারে তিলক বলেন, বিস্তারিতভাবে এই ভিন্নতার বিষয়টি তাঁর 'গীতা রহস্য'-তে বিধৃত। প্রত্যুত্তরে গান্ধী বলেন,

> লোকমান্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই আমি বলতে চাই যে, এই পৃথিবী সাধুদের জন্য নয়, এই কথা বলার যে মানসিক আলস্য আমি তার পরিপন্থী। যখন আমি বলেছি যে লোকমান্যের ঘরানার রাজনীতিতে সবই চলে, তখন আমার মনে ছিল তাঁর বহুকথিত বাক্য "যেমন কুকুর তেমন মুগুর"।

এরপর বিস্তৃতভাবে গান্ধী ব্যাখ্যা করেন যে তিনি কেন মনে করেন সাধুদের রাজনীতির বাইরে রাখা উচিত নয়। তিনি লেখেন, "যে কোনো ধর্মের চরম সত্য হল পুরুষার্থ (হিন্দু ধর্ম অনুসারে জীবনের সার লক্ষ্য) উন্নীত করা, এবং সন্ত (সাধু) হওয়া, অর্থাৎ, সকল অর্থে ভদ্রমানুষ হয়ে ওঠা। কোনো ব্যক্তি কেবলমাত্র রাজনীতিকে আলিঙ্গন করার কারণে ভদ্রমানুষ হওয়া থেকে বিচ্যুত হন না।"[১]

১৯৫৯-য়ে ধনঞ্জয় কীর তিলকের জীবনীতে গান্ধী-তিলকের এই বাদানুবাদটি বিধৃত করেন এবং গান্ধীর যুক্তির হেত্বাভাসটির প্রতি ইঙ্গিত করেন। তিলক বলেছিলেন, "রাজনীতি হ'ল জাগতিক মানুষদের এক ক্রিয়া, সন্তদের নয়"। গান্ধী এটির ভুল ব্যাখ্যা করেন এবং ভাবেন যে, তিলক বলেছেন : "সাধুদের জগতেই কোনো স্থান নেই।"[২] এই বিতর্কের আলোয় ধনঞ্জয় কীর তিলক এবং গান্ধীর অবস্থানগত পার্থক্য উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, তিলক মনে করতেন, "সন্তরা একান্তভাবে রাজনীতির জাগতিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেদের কখনো কলুষিত করবেন না।" তিনি আরও বলেন,

> যত উচ্চ নৈতিক অবস্থানেই কোনো মানুষ থাকুন না কেন, জাগতিক পৃথিবীতে আকাঙ্খিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে কিছু সাধুত্ব তাঁকে ত্যাগ করতেই হয়। যদিও এই ক্ষেত্রেও তাঁর মূল উদ্দেশ্য নিঃস্বার্থ হতে হবে। তিলক সেইটিই বলতে চেয়েছেন।[৩]

উপরি-উদ্ধৃত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে গান্ধী ও তিলকের বাদানুবাদ অনুসারে রাজনীতির ক্ষেত্রে নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তি—সাধু—থাকার প্রশ্নে আমরা দুটি অবস্থানে উপনীত হতে পারি। তিলক কিন্তু কখনোই 'নৈতিকতা' বিষয়টির সামগ্রিকতার বিপক্ষে কোনো যুক্তি দেননি। কীরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তিনি (তিলক) মনে করতেন, চরম নৈতিক মানুষকেও তাঁদের নীতির সঙ্গে কিছুটা আপোষ করতে হয়, কখনো 'কলুষিত' হতে হয়—রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অনুসরণ কালে। নীতিনিষ্ঠ রাজনীতিবিদের, তিলকের মতে, এই ক্ষেত্রে অবশ্যপূরণীয় শর্ত হল, এই আপোষ কঠোর 'নিঃস্বার্থ' উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে করতে হবে। অর্থাৎ তিনি কোনোরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কখনোই নৈতিকতার সঙ্গে আপোষ করবেন না, আপোষ শুধুমাত্র রাজনৈতিক লাভের জন্য বাঞ্ছনীয়। এই আপোষ রাজনীতিবিদের তরফে রাজনীতির জাগতিক প্রকৃতির স্বীকৃতিই শুধু। অর্থাৎ, রাজনীতির আঙিনায় কোনো ব্যক্তি অবশ্যই নৈতিক হতে

পারেন কিন্তু অজাগতিক (অপার্থিব) হওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে একজন সন্ত তাঁর অপার্থিব মূল্যবোধের ক্ষেত্রে আপোষহীন হয়ে পড়লে রাজনীতির খেলায় অনুপযুক্ত হয়ে পড়বেন। তিনি গান্ধীকে এই সন্তের মূর্তিতে দেখেছেন। গান্ধী কখনোই নিজস্ব মূল্যবোধকে অমান্য করতে রাজী ছিলেন না, এমনকি কোনো উচ্চতর সমষ্টিগত এবং নিঃস্বার্থ কারণেও। পক্ষান্তরে গান্ধী রাজনীতির প্রকৃতি পরিবর্তনেই সওয়াল করেন। তিনি তিলককে উত্তরে লেখেন, আশু কাজ হল "রাজনীতির শুদ্ধিকরণ" করা।

এই বাদানুবাদের সময়কাল ১৯২০। আমাদের আলোচনা শুরু করেছিলাম কীভাবে গান্ধী গীতা পাঠ করেন তা দিয়ে, কেননা গান্ধীর এই পাঠের ওপর অনেক ব্যাখ্যাকারই কাজ করেছেন এক উল্লিখিত বা অনুল্লিখিত ধারণা নিয়ে যে, রাজনীতির স্বরূপের 'শুদ্ধিকরণ' তথা সংস্কারই ছিল গান্ধীর আজীবন লক্ষ্য। অনেকেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, গান্ধী ছিলেন রাজনীতির মোড়কে এক সন্ত বা তার উল্টোটা। উদাহরণস্বরূপ, Bradley S. Clough-র এক পর্যবেক্ষণের কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে তিনি ঐতিহাসিক Judith Brown-এর পাণ্ডিত্যপূর্ণতাকে উল্লেখ করে বলছেন, ১৯২০ থেকে ১৯২৬ সময়কালে গান্ধীর অজস্র গীতা বিষয়ক আলোচনা প্রমাণ করে যে "জীবনের এই পর্যায়ে রাজনীতি অপেক্ষা ধর্ম তাঁর কাছে বেশি প্রাধান্য পায়; যদিও জুডিথ ব্রাউন দ্রুততার সঙ্গে স্বীকারও করেন গান্ধীর কাছে দুটি অচ্ছেদ্য ছিল"।[৪] Clough তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণে গান্ধীর গীতা-পাঠকে এক সুনিশ্চিত কাঠামোয় ফেলেন। "তাঁর চিন্তার কাঠামোয় গান্ধী গীতার ব্যবহারের মাধ্যমে রাজনীতি এবং ধর্মের বিবাহের মতো এক মেলবন্ধন গড়ে তোলেন। যে কারণে তিনি ও তাঁর অনুগামী সত্যাগ্রহীরা, ১৯৩০-এর বিখ্যাত লবণ সত্যাগ্রহের কালে সকলেই *গীতার* অনুলিপি সঙ্গে রাখতেন।"[৫] আমরা এখানে গান্ধীর গীতা ব্যবহার প্রসঙ্গে এক বিকল্প যুক্তির অবতারণা করতে চাই।[৬]

গান্ধী এবং তিলক উদারনৈতিক নাগরিকত্ব এবং রাজনীতির ধারণায় কোনোভাবে আপত্তি করেন কিনা এই প্রশ্ন যদিও ... ছুঁয়েই যাওয়া হবে। যার মাধ্যমে রাজনীতি কালক্রমে এক অঙ্গন হয়ে ওঠে যার নিয়মাবলী গোষ্ঠী ও ব্যক্তিকে তাদের নিজস্ব বৈধ স্বার্থ অন্বেষণের সুযোগ দেয়। এই প্রশ্ন যদিও গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এই লেখার উপজীব্য নয় এবং তাই শুধুমাত্র ছুঁয়েই যাওয়া হবে। তিলক আর অরবিন্দের মতো তথাকথিত চরমপন্থীরা রাজনৈতিক কার্যাবলী সম্পর্কে এক ধরনের কল্পনাপ্রবণ এবং নৈতিক ধারণা পোষণ করতেন, যেখানে জনস্বার্থ-সম্পৃক্ত কাজগুলি 'উচ্চ' বলে গণ্য করা হতো—সেই রাজনৈতিক কাজগুলির তুলনায় যার সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িয়ে থাকে, সেগুলি তাঁদের কাছে ছিল হীন নৈতিকতার। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যক্তিগত স্বার্থকেন্দ্রিক যে কোনো রাজনৈতিক ধারণার বিরোধিতা করে থাকবেন তাঁরা। গান্ধীর ব্যক্তিগত মূল্যবোধও ব্যক্তিস্বার্থ অন্বেষণের উদারনৈতিক ব্যাখ্যার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য অন্য। আমরা মোটের ওপর ১৯২০-র *আগে* এবং *পরে*, রাজনীতির সঙ্গে গান্ধীর সম্পর্কের ইতিহাসে পার্থক্য নির্ণয়ে আগ্রহী। মৌলিকভাবে হয়তো ১৯২০-র আগে গান্ধী তিলকের মতোই ব্যক্তিস্বার্থ-সম্পৃক্ত রাজনীতিকে নৈতিকভাবে অনাকর্ষণীয় মনে করেন। তিনি রাজনীতিকে তাঁর প্রকৃত সত্তায় গ্রহণ করেন—এটি এমন এক অঙ্গন যা গোষ্ঠী ও ব্যক্তিস্বার্থ অর্জনে পরিচালিত হয়। সেই কারণে তিনি গীতার আশ্রয় নেন যার মাধ্যমে তাঁর মতো সত্যাগ্রহীরা রাজনীতির নানাবিধ দুষ্কর্ম থেকে মুক্ত থেকেও তাতে

পূর্ণভাবে অংশ নিতে পারেন। গান্ধীর গীতা ব্যবহার এইভাবে তিলক ও অরবিন্দের যুগ থেকে প্রস্থানকে চিহ্নিত করে। সম্ভবত তিনিই প্রথম জাতীয় রাজনীতিক যিনি ভারতীয় রাজনীতিকে তার যথার্থ স্বরূপ অনুযায়ী, এমনকি তার স্বার্থভিত্তিক চরিত্র সহ, গ্রহণ করেন। গীতা হল সেই পাঠ যা তাঁকে সেটা করতে সাহায্য করে।

আমাদের মতে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব অনুধাবন করেই বোঝা যাবে, ১৯২০-তে গান্ধী এইভাবে গীতা ব্যাখ্যা করেছেন কেন। আসলে মনে রাখা দরকার, রাজনীতির সঙ্গে গান্ধীর সম্পর্ক একটি বিবর্তনশীল বিষয় এবং ১৯২০ নাগাদ তিনি গীতার যে ব্যাখ্যা করেন তা ছিল এই মর্মে নির্দেশাত্মক। ১৮৮৯-য়ে গান্ধীর সঙ্গে গীতার প্রথম পরিচয় ঘটে, একথা সকলেরই জানা, যখন থিয়োসফিস্ট ভ্রাতৃদ্বয় তাঁকে Sir Edith Arnold-এর অনুবাদে গ্রন্থটি পড়তে আহ্বান জানান। কিন্তু J.T.F. Jordens-এর মতে "১৯১৯-য়ে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে *গীতা*-সংক্রান্ত তাঁর নিজস্ব ভাবনা বিকশিত হতে শুরু করে এবং ১৯২৫ সালের মধ্যে তা এক পরিপূর্ণ অবয়ব পায়।"[৭] Clough জানান, ১৯২৬ থেকে ১৯৩২ সময়কালের মধ্যে "গান্ধী প্রায় ৩৬০ পাতার *গীতার* অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কাজ করেন" প্রধানত "সবরমতীর ... সত্যাগ্রহ আশ্রমের আশ্রমিকদের নানা প্রশ্নের উত্তরকালে"[৮] এই পর্যায়টিতেই ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে গান্ধীর যোগাযোগ সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ছিল। গান্ধীর গীতা-ব্যাখ্যা যে কোনো ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় নয়, এমন আলোচনা বোঝার জন্য তাঁর এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি বোঝা জরুরী; এই মর্মে অনেকেই আমাদের সাথে একমত হবেন। উপরন্তু বৌদ্ধিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গান্ধীকে তিলকের সঙ্গে বাদানুবাদের ভিতর সীমাবদ্ধ রাখা অনুচিত—যেখানে তিনি ধর্ম ও রাজনীতির পৃথিকীকরণ করেন না, রাজনীতির শুদ্ধিকরণে ও অধ্যাত্মীকরণে আগ্রহী হয়ে। এই জায়গায় আমরা একটু ভিন্নতর এক প্রকল্প উপস্থাপনায় আগ্রহী। গীতা প্রসঙ্গে গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষত ১৯২০ নাগাদ তিনি রাজনীতির শুদ্ধিকরণ সংক্রান্ত যে-বিশ্লেষণ করেন তার এক উল্লেখযোগ্য রূপান্তর দেখা যায় অসহযোগ আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে।[৯] তিনি যে কেবল রাজনীতির শুদ্ধিকরণের ধারণা থেকে সরে যান তা নয়, গীতার ভিতর তিনি সেই উপায়ের সন্ধান পান যা তাঁকে এবং তাঁর মতো অন্যান্যদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত সমস্ত রকমের দুর্নীতিপূর্ণ রীতিগুলির থেকে সুরক্ষিত রাখবে। অন্যভাবে বললে, তিলক ও অরবিন্দের বিপরীতে, ১৯২০-তে গান্ধী ভাবেননি যে রাজনৈতিক কার্যাবলী সহজাতভাবে নৈতিক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, জিন্না, সুভাষ বোস কিংবা আম্বেদকরের কাছে তিনি কখনোই তাঁর অর্থে নৈতিকতার দাবি করেননি। পক্ষান্তরে, তাঁর মূল প্রশ্ন তখন হয়ে দাঁড়ায়, কীভাবে সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ সময়ের রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে যুক্ত থেকেও তাঁর মতো কেউ জীবনের চরম উদ্দেশ্য, অর্থাৎ মোক্ষ অর্জন করতে লড়াই চালাতে পারে। এই সময়ে তাঁর নৈতিকতা চর্চার লক্ষ্য আর রাজনৈতিক ক্ষেত্র নয়, যে-অঙ্গনে বারবার জাগতিক স্বার্থের সঙ্গে নৈতিকতার বিরোধ বাধে—এ সময়ে তাঁর "রাজনৈতিক প্রচারকের" (পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত) ভূমিকা প্রাধান্য পায়। প্রতিদিন গীতা পাঠ ও আলোচনার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ঐ পাঠকে সত্যাগ্রহীর কবচে রূপান্তরিত করা। রাজনীতির "শুদ্ধিকরণ" প্রকল্পটি এই সময়ে আর লক্ষ করা যায় না। তার জায়গায় আত্মশুদ্ধি এবং আত্মসংরক্ষণের নীতি গুরুত্ব পায়। বরং, প্রকল্পটি ছিল ধারাবাহিকভাবে সত্যাগ্রহীর আত্মকে শুদ্ধ করা এবং সেভাবে সুরক্ষিত করা যাঁরা

জীবনের প্রয়োজনীয় কর্মের অংশ হিসেবে রাজনৈতিক লড়াইতে প্রবেশ করেছিল। এই বিষয়টিকেই আমরা রাজনীতিকে তাঁর নিজস্ব বাস্তব স্বরূপের প্রেক্ষিতে গ্রহণ করার গান্ধীর পথ বলতে পারি।

২

বহু হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা বিশ শতকের গোড়ার দশকগুলোতে রাজনৈতিক দর্শনের গ্রন্থ হিসেবে গীতাকে ব্যবহার করেছিলেন। ঔপনিবেশিক যুগে ইয়োরোপীয় এবং আমেরিকান পাঠককুলের কাছে আগ্রহ সৃষ্টির কারণে এই গ্রন্থের প্রায় পুনরাবিষ্কার ঘটে। ঔপনিবেশিক কর্তা, প্রচারক, কল্পনা-বিলাসী (রোমান্টিক) এবং অতীন্দ্রিয়বাদী সকলেরই আগ্রহ ছিল এতে।[১০] এর আগেও প্রাচীন ও ধ্রুপদী ভারতীয় ব্যাখ্যাকাররা নানা পর্যায়ে এটির ব্যাখ্যা করেন; তবে Eric Sharpe মনে করিয়ে দেন যে ১৮৮০-র আগে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে পুরাণের কৃষ্ণের আধিপত্য বেশি ছিল গীতার সারথি-দেবতা কৃষ্ণের চেয়ে, অন্যদিকে শৈব ও শাক্তদের মধ্যে আলোচনার ঝোঁকটি ছিল অন্যত্র।[১১]

সমকালীন পৃথিবীতে যথাযথ কর্মপদ্ধতি গঠনের ধারণা কীভাবে গীতা-পাঠের ভিতর দিয়ে পাওয়া সম্ভব তা নিয়ে গান্ধী-র সঙ্গে মিল আছে শতাব্দীশেষের অন্যান্য জাতীয়তাবাদীর —তিলক, অরবিন্দ এবং তথাকথিত ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় চরমপন্থী সকলের সঙ্গেই। শিবাজী উৎসবের লগ্নে, ১৫ জুন ১৮৯৭-এ তিলকের *কেশরী* পত্রিকায় প্রকাশিত সপ্তদশ শতাব্দীর মারাঠা রাজা শিবাজী কর্তৃক মুঘল সেনাপতি আফজল খানের হত্যার প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়। শিবাজীর এই কাজের নৈতিকতাকে সমর্থন করে এই প্রশ্ন রাখা হয় যে, "শিবাজী কি কোনো পাপ করেন আফজল খানকে হত্যা করে?" উত্তর হল যে, "এর জবাব মহাভারতে রয়েছে। ভাগবৎ গীতা অনুসারে শ্রীমৎ কৃষ্ণের শিক্ষা হল, প্রয়োজনে এমনকি আমাদের শিক্ষক ও জ্ঞাতিকুলকে হত্যা করাই যায়।" মনে হয় এই জন্যই ১৯২০-তে তিলক গান্ধীকে এই কথাই বলেন,

> সেই মানুষকে কোনো দোষারোপ করা যায় না যে ... কোনো কাজে ব্রতী হচ্ছে তার সুফল নিজে ভোগ করার বাসনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে কাজ করছে না। শিবাজী মহারাজ যেরূপ নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুধা মেটাতে এ'কাজ করেননি, আফজল খানকে হত্যার পিছনে তাঁর সদাশয় উদ্দেশ্য ছিল যা অন্যদের জন্য মঙ্গলকর।

এই অংশের শেষে বলা হয়, "দণ্ডবিধির ধারা থেকে বেরিয়ে আসুন, প্রবেশ করুন ভাগবৎ গীতার অতি উচ্চ পরিমণ্ডলে, আর তারপরই মহান মানুষের কাজের মূল্যায়ন করুন"[১২] মান্দালয় জেলে ১৯১০-১১-র শীতকালে তিলক তাঁর সুবৃহৎ সাহিত্যকর্ম "গীতা রহস্য" রচনা করেন, যেখানে তিনি শ্রদ্ধেয় শঙ্করাচার্য এবং অন্য অন্য প্রাচীন ও আধুনিক ব্যাখ্যাকারের বিপ্রতীপে গিয়ে বলেন যে, "গীতা মূলত কর্মযোগ তথা সঠিক বা যথার্থ কর্মসংক্রান্ত এক গবেষণার আকর।"[১৩]

খুবই সংগতভাবে, Sharpe পর্যবেক্ষণ করেন যে, "যে যে রাজনৈতিক পর্যায়ের সঙ্গে গীতা ব্যাখ্যার ইতিহাস সম্পৃক্ত ছিল তার স্থায়িত্ব খুব দীর্ঘ ছিল না মোটেই, বড়জোর আধডজন বৎসর বা কাছাকাছি সময়কালের মতো।"[১৪] এই প্রবণতাটি সর্বাধিক বৃদ্ধি পায় স্বদেশী আন্দোলনের সময়কালে বাংলায় (১৯০৫-০৮), যে সময়ে কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী

গোষ্ঠীতে বিভাজিত হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৭-এর এপ্রিলে পুনা থেকে প্রকাশিত সাভারকর-কৃত মাৎসিনির মারাঠী জীবনের ভূমিকায় তিনি "রাজনীতিকে ধর্মীয় স্তরে উন্নীত করার গুরুত্বের ওপর জোর দেন।"[১৫] Sharpe এই উপলক্ষে কতগুলি দরকারী সন-তারিখের উল্লেখ করেন। ১৯০৫ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে অরবিন্দ "বারংবার তাঁর লেখায় ও ভাষণে গীতা-প্রসঙ্গ আনেন"; যেমন, ২৬ ডিসেম্বর, ১৯০৬-য়ে *বন্দেমাতরম* পত্রিকায় তিনি লেখেন, "যাঁরা পাপের ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন এবং আক্রমণকে যাঁরা নৈতিকতার অবক্ষয় মনে করেন, গীতা তাঁদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তর।"[১৬] আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় মে ১৯০৯-য়ে বেকসুর খালাস ঘোষিত হবার পর গীতা প্রসঙ্গে অরবিন্দের স্বরমাত্রা তীক্ষ্ণতর হতে শুরু করে। ৩০মে ১৯০৯ তারিখে প্রদত্ত তাঁর সুবিখ্যাত উত্তরপাড়া বক্তৃতায় তিনি কারাবাসকালে গীতাপাঠের ফলে রূপান্তরসম অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন (প্রসঙ্গত Sharpe মনে করেন এর আগে গীতার সঙ্গে অরবিন্দের পরিচয় বেশ অগভীর ছিল)। উক্ত বক্তৃতায় অরবিন্দ বলেন যে, ভগবান কৃষ্ণ সকলকে, যারা তাঁর (কৃষ্ণের) কাজে আগ্রহী, তাঁদের ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করে নিষ্ক্রিয় ও অনুগতভাবে ভগবানের কাছে নিজেদের সমর্পণ করার কথা বলেন। তিনি তখনই উপলব্ধি করেন হিন্দু ধর্মের স্বরূপ।" ভগবান কৃষ্ণই তাঁকে এই অন্তর্দৃষ্টি দেন এবং বলেন, "আমিই জাতি ও তার উত্থান আর আমিই বসুদেব।"[১৭] জীবনের এই পর্যায়ে তিনি সনাতন ধর্ম ও জাতীয়তাবাদকে সমার্থক বলে বিবৃত করেন এবং শেষেরটিকে কোনোভাবেই "কেবল একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, [বরং] ... একটি ধর্ম যা ঈশ্বর থেকে এসেছে"[১৮] বলে মনে করেন। পরবর্তী পর্যায়ে অরবিন্দ গীতার আরো গভীর দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রবর্তন করেন, যা মনে হয় তাঁর নীৎসে-পঠনের প্রভাব। এই সূত্রে তিনি মনে করেন, জীবনের বৈপরীত্যগুলিকে সংকল্প ও অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে "আভ্যন্তরীণ স্থৈর্যের স্তরে"[১৯] উন্নীত করার আহ্বান হিসেবে গীতাকে দেখতে হবে। তবে এটি গীতার আধুনিক ভারতীয় ব্যাখ্যার ইতিহাসে এক ভিন্ন আখ্যান, অত্যন্ত ভিন্ন এক অধ্যায়।

মোটামুটিভাবে এটা পরিষ্কার যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তিলক, অরবিন্দ এবং অন্যান্য বহু তথাকথিত চরমপন্থীই তাঁদের নিজস্ব রাজনৈতিক কার্যাবলীর আদর্শ সংজ্ঞাকে কর্মযোগ-এর সমার্থক বলে গণ্য করতেন এবং তাঁরা দাবি করেন যে, এগুলোতেই গীতায় লিপিবদ্ধ আধ্যাত্মিক বাণীর সারমর্ম ফুটে ওঠে। জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষায় সকলের স্বার্থে কাজ করতে হলে তা অবশ্যই গীতা-অনুসারী হতে হবে। এমনকি হিংসাত্মক ক্রিয়া, যা পূর্ণত নিঃস্বার্থ এবং "সকলের" স্বার্থে নিয়োজিত, তাও ন্যায্য কর্ম হতে পারে। আদর্শ রাজনৈতিক কর্মীর কাছে গীতা রাজনৈতিক-দার্শনিক এক নির্দেশিকা হয়ে ওঠে। .Sharpe বলেন, "বাংলায় কাজ করার শেষ কয়েক বছর" অরবিন্দ গীতার কর্মযোগের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। অন্যদিকে, তাঁর ভাই, বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের কাছে গীতা বোমা তৈরির মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[২০] রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে অবসর নেবার কিছুদিন আগে *কর্মযোগীন* পত্রিকায় লেখা এক প্রবন্ধে অরবিন্দ আদর্শ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে গীতায় বিবৃত আদর্শ কর্মের দিশার সমতুলতার উল্লেখ করেন—"মিস্টার রিসলে বারংবার একটি অভিযোগ আনেন,

> যার সঙ্গে আমরা সকলে পরিচিত হয়ে গেছি যে, চরমপন্থার শাস্ত্রীয় নিদান হিসেবে গীতার অপব্যবহার করা হয়। ... গীতার একমাত্র যে উপদেশ কোনো চরমপন্থী

> অপব্যবহার করতে পারেন, তা হল এই যে, ক্ষত্রিয় হত্যা করবে কেবল তার কর্তব্যের খাতিরে এবং সে তা করতে পারে কোনোরকম পাপবোধ ছাড়াই, যদি সে তার অহংকার বিসর্জন দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে, বন্ধনহীনভাবে ঈশ্বরের জন্য, কর্মের প্রভুর কাছে কর্মের নিবেদন হিসেবে অর্পণ করে। এই শিক্ষাকে যদি ভ্রান্ত বলি, তাহলে নায়কের, সেনার, বিচারকের, রাজার এমনকি আইনসভার, যা কিনা হত্যাকাণ্ডকে বৈধতা দেয় এই সব কিছুর আর কোনো নৈতিক ভিত্তি থাকে না। এঁদের সকলকেই অপরাধী এবং মানবতা-বিরোধী বলে দণ্ডিত করতে হয়।[২১]

গীতার এইরূপ পাঠ লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসের সদস্যদের ভিতর, বিশেষত কৃষ্ণবর্মা ও সাভারকরের কাছে, যাঁরা তিলক, অরবিন্দ এবং বিপিন পালের সমসাময়িক এবং তাঁদের মতোই দেশের মুক্তির জন্য হিংসাত্মক পদ্ধতি প্রয়োগের স্বপক্ষে ছিলেন, তাঁদেরকেও উৎসাহিত করতো। তিলকের মতো বা সম্ভবত তাঁর চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরাও শিবাজী কর্তৃক আফজল খান হত্যার ঘটনাটিকে গীতা সমর্থিত ক্রিয়াকলাপের উদাহরণ হিসেবে দাবি করেন। কৃষ্ণবর্মা দেখান যে, "ভারত ইতিহাসের যে কোনো ছাত্র শিবাজীকে জানে মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রূপে। আফজল খানকে হত্যা করে তিনি দাক্ষিণাত্যে তাঁর সাম্রাজ্যের বাস্তব আধিপত্য স্থাপন করে সমস্ত হিন্দুদের শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করেন।" তাঁরা "ভারতের প্রাচীন ইতিহাস এবং সাহিত্যের" নিদর্শন টেনে যুক্তি দেন যে "রাজনৈতিক হত্যা ভারতীয়দের ধর্মীয় নীতির ক্ষেত্রে অপরিচিত নয়। ... রাম আর কৃষ্ণ, যাঁদের সারা দেশের হিন্দুরা ঈশ্বরের অবতার রূপে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে তুলেছে, তাঁরা কিন্তু অত্যাচারী রাবণ ও কংসকে হত্যা করার কারণে মূলত স্মরণীয়। বৈপ্লবিক হিংসাকে বৃটিশ ভাইসরয় 'জঘন্য অপরাধ' বলে চিহ্নিত করেন যা ভারতীয় "ধর্মানুশাসন ও মানবিক প্রবৃত্তি এবং ... আনুগত্য বিরোধী"। এই ধারণার বিপরীতে, ইন্ডিয়া হাউসের সক্রিয় কর্মীরা বলেন যে, ভারতে ন্যায্য হিংসা প্রয়োগের এক সুদীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে, সেই মহাভারতের সময় থেকে ১৮৫৭-র "স্বাধীনতার লড়াই ... যাকে ভ্রান্তভাবে বৃটিশরা সিপাহী বিদ্রোহ" বলে। কৃষ্ণবর্মা গীতার সঙ্গে স্বাভাবিক অধিকারের অন্তর্নিহিত ধারণা জড়িয়ে লেখেন,

> আমরা জানি, ইংরেজরা নিজেরাই নিজেদের রাজা প্রথম চার্লসের শিরচ্ছেদ ঘটায়, ষোড়শ লুইকে ফরাসীরা গিলোটিনে দেয়, হিন্দুরা উপরিলিখিত অনুরূপ কর্ম প্রাচীনকালে আরো বেশি করেছে ... কাজেই একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে হিংসার মোকাবিলায় প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই হিংসা প্রয়োগ করা স্বাভাবিক।[২২]

লন্ডন গোষ্ঠীর এই বিপ্লবীরা গীতার আদর্শে এক কর্মযোগীর চিত্র গড়েন যিনি 'এক রাজনৈতিক প্রচারক'; অংশত গান্ধীও সত্যাগ্রহীর আদল গড়ে তোলেন প্রায় সেই আদর্শেই (অবশ্যই, চরমপন্থী হিংসার বিষয় বাদ দিয়ে)। Indian Sociologist পত্রিকার (যে-পত্রিকার টাইটেল পেজে হার্বার্ট স্পেন্সারের ঋণ স্বীকৃত) ১৯০৭ সালের মে মাসের সংখ্যায় এক অনামা চিঠি প্রকাশিত হয়, যেখানে পত্রলেখক নিজেকে এমন একজন বলে চিহ্নিত করেন "যিনি, রাজনৈতিক প্রচারক হতে প্রস্তুত।"[২৩] সম্পাদকের বার্তায় এই লেখকের পরিচিতিতে বলা হয় যে তিনি "এক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের উচ্চ মানের স্নাতকোত্তর" যিনি বর্তমানে "রাজনৈতিক প্রচারকের কর্তব্য পালনে উপযুক্ত হয়ে উঠতেই ইতিহাস, রাজনীতি

এবং ইউরোপের সমান্তরাল সংস্কৃতি চর্চায় নিয়োজিত; এবং ভারতের সুসন্তানরূপে তিনি তাঁর সমস্ত সময় ও শক্তি দেশের কারণে ব্যয় করতে প্রস্তুত।" "রাজনৈতিক প্রচারকদের" এক সংঘ পর্যবেক্ষণ করে যে এই অনামা লেখক (আমরা এখন জানি, তিনি হরদয়াল) "জাতীয় ঐক্য ও ভারতের স্বাধীনতা"র লক্ষ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময়। এই ধরনের ব্যক্তিকে (প্রচারক) "বিশ্বাস রাখতে হবে এক চরম সত্যে যে, জীবন ধর্ম্মোদ্দেশে প্রেরিত"। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের সেই বিখ্যাত উক্তি "কর্মন্যেবধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন" ("ফলের আশা না করে যে-কর্মে তোমার অধিকার তা করে যাও")—এই কথা উদ্ধৃত করে পত্রলেখক উদ্যমী জাতীয়তাবাদীদের সনির্বন্ধ আহ্বান করেন—"প্রত্যেক হিন্দু শিশু"র সুপরিচিত "আত্মত্যাগের আদর্শ"-য়ের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে ভারতবর্ষের অজস্র লক্ষ মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন। রাজনৈতিক প্রচারকরা সতত প্রস্তুত থাকবে "জাগতিক উন্নয়নের সমস্ত সম্ভাবনাকে অবজ্ঞা করে" নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করতে পিতৃভূমির কাজে, "ঈশ্বরাজ্ঞা পালনের মতো দায়িত্ব-জ্ঞানে।" এই কাজে তাদের কখনোই নিজেদের "অন্তরঙ্গ এবং প্রিয়তম আত্মীয়দের ভীরু বিবেচনাবোধ" দ্বারা নিবৃত্ত হওয়া উচিত হবে না। পিতা-মাতা-ভ্রাতা-বন্ধু সকলের থেকে আপন হয়ে উঠবে তাদের এই মহান "আদর্শ"। এই কাজে তারা ব্রতী হবে এক "ধর্মীয় আন্তরিকতায় এবং আত্মকৃচ্ছতার উদ্দীপনায়।" "জাপানের কমান্ডার হিরোনোর মতো তারা মনস্তাপের দুঃখ পাবে কারণ তাদের কাছে দেশকে দেবার মতো মাত্র একটি জীবনই আছে।" একজন রাজনৈতিক প্রচারক "সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি ত্যাগ করবে, কোনো পেশা পরিগ্রহণ করবে না, তার সমগ্র জীবন ও শক্তি কেবল ঐ আন্দোলনের জন্য উৎসর্গ করবে।" দ্বিতীয়ত, এক রাজনৈতিক প্রচারক অবশ্যই "তাঁর নিজের দেশের ইতিহাস অধ্যয়ন করবেন", একই সঙ্গে ইয়োরোপের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস অধ্যয়নও জরুরী, যাতে তাঁর উদ্দীপনার পিছনে সদৃঢ় যুক্তিবাদী অনুসন্ধিৎসা কাজ করে। তাঁর "রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, যার সমাধান নয়া ভারতের প্রয়োজন।" তৃতীয়ত, রাজনৈতিক প্রচারককে চিরকৌমার্যের ব্রত গ্রহণ করতে হবে। মাৎসিনির মতো তার দেশের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ থাকা উচিত। জাতির প্রতি তাঁর কর্তব্যবোধের হেতু তাঁকে "সমস্ত সামাজিক দায় ... সাংসারিক দায়িত্ব ও উৎকণ্ঠা বাতিল করতে হবে", কারণ এগুলি তার মনকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে। সর্বোপরি, এই তরুণরা "মানসিক দিক থেকে বিশেষ হিসেবী" হবেন না। এই জাতীয় সংকটকালে, যখন "সামাজিক সত্তা" হিসেবে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন সেই অবস্থায় একজন রাজনৈতিক প্রচারকের "এক দোকানদারের নয়, এক যথার্থ নায়কের উদ্দীপনায় কাজ করা উচিত।"

৩

তিলক এবং লণ্ডনের ইন্ডিয়া হাউস গোষ্ঠীর থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করেন গান্ধী, যদিও হিংসার প্রতি তাদের তীব্র আবেগকে তিনি অনমনীয়ভাবে বিরোধিতা করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে তিনি তাদের বুনিয়াদী হেতুবাক্য হিসেবে এই ধারণা পোষণ করতেন যে রাজনৈতিক ক্রিয়া, তার উচ্চতম রূপে কঠোর সংযমী ও আধ্যাত্মিক তাড়না দ্বারা আকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। David Hardiman একটি প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত দেন যে ১৯০৯ সালে (সম্পাদক ও পাঠকের মধ্যেকার) সংলাপাকারে *হিন্দ স্বরাজ* রচনাকালে গান্ধী সম্ভবত একই সঙ্গে লন্ডন

গোষ্ঠীর চরমপন্থী যাঁরা Indian Sociologist -এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক মতবাদের পরিচয় দেন ও স্পষ্ট সমালোচনা করেন। Hardiman আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন, এই গোষ্ঠী "সামগ্রিকভাবে ভারতে বৃটিশদের বিরুদ্ধে উগ্রপন্থা ও হিংসার ব্যবহারের পৃষ্ঠপোষকতা করে। গান্ধী স্পষ্টত মনে করতেন, তাঁদের এই কৌশলের প্রতি বিশ্বাসের বিরোধিতা করা তাঁর কর্তব্য।"[২৫] আমরা যখন গান্ধীর গীতা-ভাষ্যের ব্যাখ্যা থেকে যোগ, কর্ম, আদর্শ ব্যক্তি, মানবজীবনের পরম লক্ষ্য ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা করি, এটা স্পষ্ট বোঝা যায়, গান্ধী চরমপন্থীদের নিজের *পূর্বপক্ষ* মনে করেন। যদিও তাঁর কল্পনার সত্যাগ্রহী আসলে চরমপন্থীদের আদর্শ রাজনৈতিক প্রচারকের উপরের মোড়ক আর তাঁর আশ্রমও নানাভাবে Indian Sociologist-এর পাতায় আলোচিত "সমাজে"র অনুরূপ।

একথাও অবশ্যই সত্য যে এক বিমূর্ত স্তরে গান্ধী ১৯০৯-এর *হিন্দ স্বরাজে* আভাসিত নীতিগুলি অনুসরণ করেন। তাই ১৯৪৫-এর অক্টোবরে নেহরুকে লেখেন, "আমি এখনও 'হিন্দ স্বরাজ'-য়ে নিরূপিত সরকারী ব্যবস্থার সমর্থক।"[২৬] কিন্তু তাঁর ১৯২০-র গীতা-সন্দর্ভের এক সতর্ক পঠন রাজনীতির প্রেক্ষিতে তাঁর নিজস্ব অবস্থানের ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সরণ চিহ্নিত করে। আমাদের মতে তাঁর বাস্তব লক্ষ্য তখন আর রাজনীতির 'শুদ্ধিকরণ' বা অধ্যাত্মীকরণ প্রকৃত অর্থে ছিল না। এই পর্যায়ে তিনি অধিক উদ্বিগ্ন ছিলেন যে প্রশ্নে, তা হল তিনি এবং অন্যান্যরা, যেমন উদাহরণস্বরূপ, তাঁর আশ্রমিকরা, যাঁরা *সত্যাগ্রহে* দীক্ষা নিয়েছেন, তাঁরা কীভাবে নিজেদের সত্তাকে সুরক্ষিত রাখবেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অবশ্যম্ভাবী দুর্নীতি ও অবক্ষয় থেকে—একই সঙ্গে রাজনীতিতে পূর্ণভাবে নিমজ্জিত থেকেও। প্রত্যহ গীতা পাঠ এবং তাকে নিবিষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করাকে তিনি এক অপরিহার্য প্রতিষেধক মনে করেন যা সত্যাগ্রহীকে নৈতিক দুর্নীতির জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে সাহায্য করবে। এইভাবে গান্ধী হয়ে ওঠেন প্রথম জাতীয়তাবাদী যিনি একই সঙ্গে রাজনীতিতে সংযুক্তি চেয়েও রাজনীতির কদর্য দিক থেকে বিযুক্তি ও প্রতিরোধের দিশা দিয়ে রাজনীতিকে তার বাস্তব রূপে গ্রহণ করেন।

আসলে মনে রাখতে হবে যে, ১৯০৯-য়ে যখন সংসদীয় গণতন্ত্রকে নীতিগতভাবে বিরোধিতা করে তিনি *হিন্দ স্বরাজ* লেখেন তার সঙ্গে ১৯২০-র পরিস্থিতির এক বড়োসড়ো পার্থক্য ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে, এক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংসদের প্রতি পূর্ণত অনাস্থা থাকা সত্ত্বেও গান্ধী এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন যেখানে তাঁকে নিরন্তর মধ্যস্থতা করতে হয় যাতে ১৯১৯ থেকে ১৯৩৭-এর মধ্যে যে-রাজনীতি ঈঙ্গ-ভারতীয় সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে সূচিত হয় তাতে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় স্থান পায়। সেই আধা-সংসদীয় রাজনীতি নির্বাচন, প্রতিনিধিত্ব এবং সাংখ্যিক গঠনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে মনে করা দরকার *হিন্দ স্বরাজে* গান্ধী সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছিলেন।

> যাকে তোমরা সংসদের জননী বলে মনে করো তা আসলে এক বন্ধ্যা নারী এবং বেশ্যা। এই দুটিই রূঢ় শব্দ হলেও এক্ষেত্রে যথার্থ। এখনও পর্যন্ত সংসদ তার নিজস্বতার জোরে একটিও ভালো কাজ করেনি, সেই কারণেই একে আমি বন্ধ্যানারী বলি। সংসদের প্রকৃতিগত অবস্থান এমনই যে বাহ্যিক চাপ ছাড়া সংসদের পক্ষে কিছু

করা সম্ভব নয়। এটি বেশ্যার মতো কারণ এর নিয়ন্ত্রণে থাকা মন্ত্রীরা, সময়ে সময়ে পাল্টে যায়। আজ এটির কর্তৃত্বে Mr. Asquith তো আগামীকাল হয়তো এর কর্তৃত্বে থাকবেন Mr. Balbow.[২৭]

হিন্দ স্বরাজের সাম্প্রতিক সম্পাদক Anthony Parel গান্ধীকে তাঁর নিজের থেকে কিছুটা রক্ষা করতেই বলেন যে, "এই স্তবকটির ব্যাখ্যায় এটা মনে করা উচিত নয় যে, গান্ধী সংসদ প্রতিষ্ঠানটিরই বিরোধী ছিলেন।" গান্ধীর ১৯২০-র উক্তি উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারতের জন্য গান্ধী আসলে "এমন এক সংসদ চান যা জনগণ দ্বারা মনোনীত এবং অর্থনীতি, পুলিশ, সামরিক বাহিনী, নৌবাহিনী, বিচারালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির চূড়ান্ত ক্ষমতা তাদের হাতে থাকবে"। ১৯২১ সালে তিনি *হিন্দ স্বরাজের* পাঠকবর্গকে উপদেশ দেন যে, তাঁর সমিতিবদ্ধ কার্যক্রম "জনগণের ইচ্ছাক্রমে সংসদীয় *স্বরাজ* অর্জনে নিবেদিত।"[২৮] Parel ১৯৪৫-এ তাঁর এক চিঠিকে উপেক্ষা করে গেছেন (যা পরবর্তীতে তিনি তাঁর সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেন), যেখানে গান্ধী *হিন্দ স্বরাজে* নিরূপিত "শাসন ব্যবস্থা"র উপর আস্থা রাখেন এবং যে ব্যবস্থা সংসদীয় গণতন্ত্র ছিল না। এছাড়াও, 'জনগণের ইচ্ছাক্রমে'—এই শব্দবন্ধের ব্যবহার থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, ঔপনিবেশিক সাংবিধানিক সংস্কারের বাস্তবতাকে তিনি গ্রহণ করে নেন। কারণ, এই সংস্কারগুলি ভারতীয় রাজনীতির মূল ভিত্তি তৈরি করছিল, তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি নয়। এই ঘটনাকেই আমরা গান্ধীর তরফে ভারতীয় রাজনীতিকে তার বাস্তব সত্তার নিরিখে গ্রহণ করা বলি, এখানেই তিনি বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন সেই কল্পিত পথের থেকে যা আগে তাঁর চিন্তাকে এবং চরমপন্থীদের প্রভাবিত করেছিল—যাতে মনে করা হতো, রাজনীতির স্বরূপ হচ্ছে একটি নৈতিক বা আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় প্রকল্প।

কিন্তু রাজনীতিকে এভাবে মেনে নেওয়া মানে এই নয় যে একজন সত্যাগ্রহী হিসেবে গান্ধী তাঁর নিজস্ব মূল্যবোধের সঙ্গে কোনো প্রকার আপোষ করেন, এমনকি যদি তা সকলের স্বার্থে সম্পাদিত বলে দেখানো বা বোঝানোও হয়, এবং সেই অর্থে বিবেকপ্রসূত ও নিঃস্বার্থ হলেও নয়। যদি এরকম কিছু হতো, রাজনীতি হতো সেই ক্ষেত্র যেখানে তিনি নিজে সত্যাগ্রহ চর্চা করতেন এবং অন্যান্য সত্যাগ্রহীদের করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি, বিগত দিনের চরমপন্থীদের বিপরীতে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে সামগ্রিকভাবে সংস্কার করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে অপরিহার্যভাবে নৈতিক বলতে প্রত্যাশী হন। তিনি সর্বদা মানতেন যে রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্যান্য বৈধ পেশাদাররা থাকবেন, যারা তাঁর থেকে যথেষ্ট ভিন্ন নিয়মে কাজ করবেন। সেক্ষেত্রে এক সত্যাগ্রহীর তার নিজের প্রতি দায়িত্ব হবে রাজনৈতিক কাজে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত থেকেও তার নিজস্বতা বজায় রাখাকে সুনিশ্চিত করা। "নিজের জন্য নিজে" এই সুরক্ষামূলক কাজ—যেমন এক অগ্নিনির্বাপককে আগুন নেভানোর সময় জানতে ও পড়তে হয় সুরক্ষার সরঞ্জাম—ছিল চির-অসম্পূর্ণ এক অনুশীলন, যে জন্য গীতা হল, এক প্রাত্যহিক সংস্থান। এই কারণেই এটা আশ্চর্যের নয় যে গান্ধীর প্রাত্যহিক গীতা-সন্দর্ভের প্রাথমিক ও অভিপ্রেত শ্রোতারা হওয়ার কথা তাঁর আশ্রমিকদের, সম্ভাব্য ও প্রকৃত সত্যাগ্রহীরা এবং যারা তাঁকে লিখতেন নিজেদের জীবন পরিচালনার জন্য উপদেশ যাঞ্চা করে। কিন্তু কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ মানুষকে সত্যাগ্রহী বলা যাবে না

এবং তারা তাঁর অভিপ্রেত শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্তও হয়নি। কেবলমাত্র সত্যাগ্রহীদেরই প্রয়োজন ছিল অর্থাৎ যারা রাজনীতির জগতে টিকে থাকতে এই প্রাত্যহিক প্রস্তুতিসূচক অনুশীলন হিসেবে 'নিজের জন্য নিজে'র কাজে প্রকৃতই দায়বদ্ধ।

যে পার্থক্যটি আমরা এখানে চিহ্নিত করছি রাজনৈতিক কার্যাবলী এবং নিজস্ব কৌশলের মধ্যে যা এক *সত্যাগ্রহীকে* রাজনৈতিক কর্মে যুক্ত থাকার জন্য অবলম্বন করতে হতো তার গতিপথ আমরা গান্ধীর গীতা-সন্দর্ভের মধ্যেই খুঁজে পাই। গান্ধী কখনো কখনো নিজেকে রাজনীতিতে বহিরাগত বলে মনে করার ব্যাপার প্রকাশ করেছেন এবং রাজনীতি বিষয়টিকেই 'বিরক্তিকর'[২৯] বলে উল্লেখ করেছেন। কোনো এক বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রচার কাজের পর্যবেক্ষণ হিসেবে গান্ধী বলেছিলেন যে "সামাজিক সংস্কার বা আত্মশুদ্ধিকরণের কাজ ... আমার কাছে তথাকথিত রাজনৈতিক কাজের থেকে শতগুণে প্রিয়।"[৩০] গান্ধীর গীতা-সংক্রান্ত শতাধিক চিঠি এবং সন্দর্ভে তিনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে তাঁর লক্ষ্য কিছু পদ্ধতি গড়ে তোলা—যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি নিজেকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করতে পারবে। আদর্শ সত্যাগ্রহী রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও অকলঙ্কিত, শান্ত এবং নিয়ন্ত্রিত থাকবেন, গীতায় যাকে *স্থিতপ্রজ্ঞ* বলা হয়েছে। রাজনীতি কখনোই তার সত্তাকে কলুষিত করতে পারবে না। এই উদ্দেশ্যে গীতা গান্ধীর কাছে "আধ্যাত্মিক অভিধান", "গুরু", "মাতা"—যে তাঁর সন্তানদের "সব সময়ে নিরাপদে রাখে যদি তারা তাঁর ক্রোড়ে আশ্রয় চায়"—এবং "কামধেনু" স্বরূপ (যে গাভী সব ইচ্ছা পূরণ করে)।[৩১]

গান্ধীর গীতা পাঠ-য়ের প্রথম কৌশল গীতাকে এক রূপক হিসেবে দেখা। এই পথটি কিছু অভিনব নয়, কারণ ঊনবিংশ শতকের ভারতীয় থিওসফিস্টরাও এটি প্রথমে অনুসরণ করেছিল।[৩২] গান্ধী তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, কৌরব এবং পাণ্ডবদের লড়াইকেও এক রূপক হিসেবে দেখেন—যে লড়াই হয়েছিল "ভালো এবং মন্দের অজস্র শক্তির মধ্যে, যা আমাদের মধ্যে ব্যক্তিরূপারোপিত হয় পাপ ও পুণ্য হিসেবে"।[৩৩] এই কৌশলের ফলে গীতাকে তিনি এক পাঠরূপে পড়তে সমর্থ হন যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের অন্তঃসত্তার পরীক্ষণে সক্ষম হয়। *Discourse*-এর আগেকার অধ্যায়গুলিতে তিনি লক্ষ করেন, "হিংসা-অহিংসার প্রশ্নকে সরিয়ে রেখে গীতা এক *ধর্মগ্রন্থ* যা মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে তার কর্তব্য ব্যাখ্যা করে"।[৩৪] অথবা ১৯২৬-এর ৯ মার্চ তিনি যেমন লেখেন,

> মহাকাব্যের মূল লক্ষ্য হল সব অদৃশ্য যুদ্ধের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অদৃশ্যটিকে উপস্থিত করা। এখানে আমাদের মনে কৌরবদের সাথে যুদ্ধরত অর্জুন ও অন্যান্য পাণ্ডবদের কথা বলে। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে কেউ যেসব নৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হয় তা পার্থিব যুদ্ধগুলোর চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ... গীতা দেখায় কীভাবে আমরা সুরক্ষিতভাবে বেরিয়ে আসতে পারি ... কৃষ্ণ হলেন আমাদের মধ্যেকার *আত্মা*, যিনি আমাদের সারথি।[৩৫]

গীতাকে রূপক হিসেবে পাঠ করা সহজাতভাবেই এক ইতিহাস-বিরোধী পদক্ষেপ। গান্ধীর বিবেচনায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ "বহু হাজার বছর আগে ঘটা কোনো যুদ্ধ নয়, এটি সব

সময়ে চলে নিরন্তর, এমনকি আজও।"[৩৬] নগর সম্প্রদায়, ব্যক্তি-চরিত্রের অনুপুঙ্খ বর্ণনা অনেক সময়েই সাধারণ পাঠককে বিভ্রান্ত করে; তাঁরা কল্পনা করেন ব্যাস কোনো এক ঐতিহাসিক যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু গান্ধী বলেন, এই পাঠটিতে ঘনিষ্ঠভাবে অনুপ্রবেশ করলে এটা উপলব্ধ হয় যে "যুদ্ধের বিবরণ কেবল এক অজুহাত মাত্র।" গীতা-পঠনের এই পদ্ধতির মাধ্যমে গান্ধী এই পাঠ-এর প্রতি তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁর রাজনৈতিক পূর্বসূরীদের বিশেষভাবে চরমপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির এক তীক্ষ্ণ পার্থক্য চিহ্নিত করেন। চরমপন্থীরা গীতার মধ্যে পেয়েছেন তাদের সহিংস রাজনৈতিক কর্মের আধ্যাত্মিক ন্যায্যতা যেমন অতীতে (আফজল খানের বিরুদ্ধে শিবাজী-র) তেমনই ভবিষ্যতে (বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে তাদের)। গান্ধী স্মরণ করেন, "যখন আমি লন্ডনে ছিলাম, অনেক বিপ্লবীদের সাথে আমার কথা হয়েছে",

> শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, সাভারকর এবং অন্যান্যরা আমাকে বলতেন যে, তাদের কৃতি সম্পর্কে আমি যা বলেছি *গীতা* ও *রামায়ণ* ঠিক তার বিপরীত শিক্ষাই দিয়েছে। তখন আমি ভাবতাম যে, যদি ব্যাসদেব আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রচারের জন্য এই যুদ্ধের উদাহরণ না আনতেন, তাহলে কতই না ভালো হতো। উচ্চশিক্ষিত ও চিন্তাশীল মানুষ যদি *গীতা*-র এমন অর্থ করেন, তবে সাধারণ মানুষের কাছে আমরা কী আশা করতে পারি?[৩৭]

কিন্তু গীতা যদি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুদ্ধের আকর গ্রন্থ না হয়ে মানুষের অন্তরে অনন্ত যুদ্ধের রূপক হয়ে থাকে, তবে তার প্রয়োজন কী? গান্ধী এখানে জোর দেন যে "গীতা বাস্তব জীবনের সঙ্গে বড়ই সংযুক্ত।" তিনি বলেন, "যে *ধর্ম* বাস্তব চাহিদার পূরণ ঘটায়না তা কখনোই *ধর্ম* নয়, তা *অধর্ম*।"[৩৮] কিন্তু এই কাব্যিক ও দার্শনিক গ্রন্থটি কোন্ অর্থে বাস্তব? আবার, গান্ধীর, সন্দর্ভ স্পষ্টভাবে দেখায় যে গীতা শুধু আমাদের "অন্তর্দ্বন্দ্বের" পরীক্ষার সরঞ্জামই নয়, বরং এটি "অন্তর্সংগ্রামের" এক শিক্ষাক্রমও বটে। তাই,

> *মহাভারত* এক অনন্য কীর্তি এবং তাতে *গীতার* এক অনন্য স্থান আছে। এক বাস্তব যুদ্ধের বর্ণনার আড়ালে এক অদৃশ্য যুদ্ধের বর্ণনা যার মাধ্যমে দেখায় যে এক বাস্তব যুদ্ধে শুধু বিজিতরা পরাস্ত হয় না, বিজয়ীরাও পরাজিত হয়। তবে তার অর্থ এই নয় যে আমরা দ্বন্দ্ব থামিয়ে দেবো।[৩৯]

এইভাবে সর্বদা ব্যক্তির নিজের কাছে এক দায়বদ্ধতা থাকে, যা অবশ্যই তার নিজের জন্য নিজের কাজের নৈতিক ভিত্তি :

> *গীতাতে* সকৌশলে লেখক যুদ্ধের ব্যবহার করে মহান সত্যের শিক্ষা দেন। পাঠক সতর্ক না হলেই বিভ্রান্ত হবে। ধর্মের প্রকৃতিই এটা যে, সদাসতর্ক না থাকলে সহজে কেউ ভ্রমের ফাঁদে পড়তে পারে।[৪০]

গান্ধী অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে গীতা থেকে কতগুলো বিশেষ কৌশল তুলে আনেন যেগুলো একজন আদর্শ সত্যাগ্রহীকে রাজনীতি থেকে সুরক্ষিত রাখবে পুরোপুরি রাজনৈতিক হওয়া সত্ত্বেও; "এখনকার রাজনীতিতে", তিনি লেখেন,

> এখনকার রাজনীতিতে কিছুই ভালো নেই। অজস্র মন্দ; এটি মিথ্যে আশায় পূর্ণ এবং কোনো বিপদের থেকে সুরক্ষা দেয় না, উপরন্তু বিপদ দ্বারা বেষ্টিত। আমাদের *আত্মোপলব্ধিতে* এটি কোনো সাহায্য করে না, আমরা আমাদের আত্মাকেই আসলে হারিয়ে ফেলেছি।[৪১]

নিজস্ব সঠিক ধর্মে বা গীতা যেমন সুপারিশ করেছে, *স্বধর্মে* স্থিত থাকাই হলো একটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ : আমরা যদি আমাদের *ধর্মচ্যুত* হই তবে ভালো কাজ করার সক্ষমতা হারাবো, এই বাস্তব ও অপার্থিব দুই জগৎই হারাবো।[৪২]

সত্যাগ্রহীর আদর্শ *ধর্ম* ছিল *স্বরাজের* জন্য অবিরাম কাজ করে যাওয়া কিন্তু *স্বরাজ* বলতে গান্ধী (আক্ষরিক অর্থেই আত্ম-শাসন) বুঝিয়েছেন—যে শব্দটি তিনি তাঁর বিরোধীদের অভিধান থেকে নেন; চরমপন্থীদের কাছে এটি রাজনীতির থেকেও অনেক বড়, যদিও রাজনীতি তার সম্পূরক অংশ।[৪৩] তাঁর *স্বরাজ*-বোধের আওতায় তিনি, মরমী *মোক্ষের* আদর্শ, দেহ থেকে এবং জন্মের চক্র থেকে আত্ম-র মুক্তি অন্তর্ভুক্ত করেন (যাকে অনেক সময় 'আত্মা' বলে ভুল অনুবাদ করা হয়)। নিজের অনুভূতিগুলোকে জয় করার নিরন্তর প্রচেষ্টার মধ্যেই পথ। ১৯২০ সালে গান্ধী বলেন, *স্বরাজ* একটি স্তরে এমনই এক বিষয় ছিল যা আক্ষরিকভাবে সক্ষমতা ও নৈপুণ্যের—যারা আমাদের নীচে নামায় তাদের থেকে ভীতি-মুক্ত হয়ে, জীবন যাপন করতে। কিন্তু এই ক্ষমতা একই সঙ্গে মরমী ও রাজনৈতিক হতে পারে।

> সরকার যে ক্ষতিকর ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে এবং যা টিঁকে থাকে শুধুমাত্র ভালো মানুষদের সমর্থনে; সেই সমর্থন তুলে নিলে তা আর টিঁকে থাকবে না। সরকারের যেমন টিঁকে থাকার জন্য ভালো লোকদের সমর্থন লাগে, তেমনি দুর্যোধনের দরকার পড়েছিল ভীষ্ম-দ্রোণকে—এটা দেখানোর জন্য যে ন্যায়বিচার তার পক্ষে।[৪৪]

তবু *স্বরাজের* জন্য সংগ্রাম যেন কখনোই সহিংস না হয়। তাহলে বিঘ্নিত হবে গীতার অন্য একটি নীতি—যা হল নিরাসক্তভাবে কর্মে লিপ্ত থাকা। অতি উদগ্রভাবে এমনকি *স্বরাজ* অর্জনের লক্ষ্যে জড়িয়ে পড়লে ন্যায়সঙ্গত কাজ থেকে নিবৃত্ত হতে হবে।

> আসক্তি নিয়ে আমরা কোনো কাজ করবো না। সৎকর্মের প্রতি আসক্তিও কি অনুচিত? হ্যাঁ। আমরা যদি *স্বরাজ* অর্জনের লক্ষ্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ি তাহলে আমরা খারাপ উপায় অবলম্বন করতে দ্বিধা করবো না, ... তাই ভালো কাজেও নিরাসক্ত থাকা দরকার। একমাত্র তখনই উদ্দেশ্য ও উপায় দুইই পবিত্র থাকে। ... যে মানুষ পুরস্কারের জন্য কাজ করে, নিঃসন্দেহে সে আমাদের করুণার যোগ্য।[৪৫]

এই নিরাসক্তির ধারণা তাঁর অহিংসা-র কেন্দ্রীয় নীতি। গান্ধী সম্পূর্ণভাবে স্বরাজ শব্দের দ্ব্যর্থব্যঞ্জকতাকে কাজে লাগান—"আত্ম-নিয়ন্ত্রণ নাকি আত্ম-শাসন। স্বরাজের লক্ষ্যে প্রাণপণ চেষ্টা করা আসলে এক ধ্রুব ও অবিরাম সংগ্রাম। কারণ "এই দেহে সম্পূর্ণভাবে অহিংসার নীতি অনুসরণ করা অসম্ভব।"[৪৬] গান্ধীর মতে গীতা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে "অমঙ্গল প্রত্যেক কর্মেরই সহজাত। ... অর্জুন হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন ... না তুলে সাধারণভাবে জ্ঞাতি ও অন্যান্যদের পার্থক্যের প্রশ্ন তোলেন। ঠিক যেমন স্নেহময়ী মা তাঁর সন্তানের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে

যান।"[৪৭] এটা রাজনৈতিক প্রচারক বা সত্যাগ্রহীর অবশ্যপালনীয় কর্তব্য, নিরাসক্তভাবে অহংবোধ ত্যাগ করে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। "একজন কতটা বৈরাগ্য (নিরাসক্তি) রপ্ত করেছে বা কতটা অধ্যাবসায়ের সঙ্গে সৎকর্ম করেছে বা কতটা ভক্তির চর্চা সে করে—এগুলো কোনো ব্যাপার নয় যদি না সে "আমিত্ব" ও "আমার" বোধ ত্যাগ করতে পারে, যতক্ষণ না সে জ্ঞান অর্জন করতে পারে।"[৪৮]

আসলে কেউই জীবদ্দশায় চরম জ্ঞানার্জনের পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না। মানুষ শুধু নিরন্তর প্রয়াস চালাতে পারে সেই শর্তগুলো গড়ে তোলার জন্য যা তাকে চরমজ্ঞানের আধার হয়ে ওঠার উপযুক্ত করে তুলতে পারে। গান্ধী বলেন, "কোনো ব্যক্তিকেই ভালো বলবে না যতক্ষণ না সে পরলোকগমন করছে।" কেননা, "যদি কোনো ব্যক্তি *ব্রাহ্মী* স্তরে তিরোহিত হয়, তবেই আমরা জানতে পারি যে সে *মোক্ষপ্রাপ্ত* হয়েছে।"[৪৯] তিনি অন্যত্র আরও দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে,

> যে মানুষ শরীরে যখন বেঁচে আছেন, তখন তিনি মুক্তি অর্জন করেছেন একথা বলা শব্দার্থের প্রতি হিংস্রতা-ব্যঞ্জক, কেননা মুক্তির প্রয়োজন থাকে যতক্ষণ তার শরীরের সাথে সংযোগ থাকে। একটু গভীরে ভাবলেই দেখা যায়, যদি আমাদের অহং-আসক্তি পুরোপুরিভাবে বিলুপ্ত হয় তবে শরীর টিঁকে থাকতে পারে না।[৫০]

অথবা, ইন্দ্রিয়ের কামনার অবসান একমাত্র দৈহিক মৃত্যুতে। এটি নিঃসন্দেহে অতি নিষ্ঠুর বক্তব্য, কিন্তু *গীতা* কখনোই তীর সত্যকথনে বিরত হয় না।[৫১]

যদি আপ্রাণ প্রচেষ্টা হয় নিরন্তর, তার প্রয়োজন হয় কিছু কৌশলের, কিছু নিত্যকর্মের যার দ্বারা কেউ সত্যাগ্রহী হয়ে ওঠা শুরু করতে পারে। কোথায় শুরু করতে হবে? এটা দেখা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক যে, যখন কৃষ্ণবর্মার মতো গান্ধীও *ব্রহ্মচর্য* বা কৌমার্যের চর্চা এবং বস্তুগত স্বত্বাধিকারে নিরাসক্তিকে মূল্য দিয়েছেন রাজনৈতিক প্রচারক বা সত্যাগ্রহীর গুরুত্বপূর্ণ নিত্যকর্ম হিসেবে, যদিও এসব যথেষ্ট গ্যারান্টি দেয় না যে সত্যাগ্রহীরা আসক্তিকে জয় করবে। এমনকি জীবন উৎসর্গ করাও যথেষ্ট নয়। "বহু মানুষ সহাস্যে ফাঁসির মঞ্চে উঠলেও, তাঁরা পার্থিব জগত থেকে বিদায় নেন অন্য জগতে ভবিষ্যতের কোনো সম্ভাবনা না রেখে।"[৫২] "প্রয়োজন হল কামনাকে জয় করা। দেহকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ব্যক্তি খাদ্যগ্রহণ করবেই, কিন্তু সে যদি দেখে খাদ্যগ্রহণ তার ক্ষুধার প্রবৃত্তি বাড়িয়ে দিচ্ছে, তবে অবিলম্বে খাওয়া বন্ধ করা উচিত।"[৫৩] কাজেই শুধুমাত্র উপবাস বা ব্রহ্মচর্য ব্যক্তিকে *স্থিতপ্রজ্ঞ* মার্গে উন্নীত হওয়াকে নিশ্চিত করে না। গান্ধীর মতে, "এর অধিক কিছু প্রয়োজন।" এক পীড়িত শরীরও খাদ্য অথবা ভালো জীবনের চিন্তা থেকে দূরে সরে গেছে। প্রাত্যহিক অহংবোধকে নির্মূল করার প্রশ্নটিকে ফিরিয়ে দিয়েছে পীড়াগ্রস্তের এবং স্থিতপ্রজ্ঞের শরীরের পার্থক্য।

> ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-সুখানুভব যদি দূর হয়, সে যদি *সমাধি*তে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, সে যদি পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হয় তবে জিহ্বার অগ্রভাগে দেওয়া কোনো কিছুই দ্রবীভূত হবে না। এইভাবে যে মানুষ সুখানুভব থেকে সরে গেছে ও যে মানুষ পীড়াগ্রস্ত তারা শেষ পর্যন্ত একই দশায় পৌঁছোবে, একজন স্বেচ্ছায়, অন্যজন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।[৫৪]

কিন্তু কীভাবে *সত্যাগ্রহী* তার অহংবোধ নির্মূল করবে? এটির প্রথম এবং সম্ভবত সর্বাপেক্ষা কঠিন পর্যায় হলো আত্মসমর্পণের দীক্ষা; কোনো উর্দ্ধতন সত্তার কাছে আত্মসমর্পণ। আবার, গান্ধী কৃষ্ণ ও অর্জুনের সম্পর্কের উদাহরণ টেনে বলেন, হতাশার খোলস ছাড়লেই জানবার সত্য আগ্রহ জেগে ওঠে। "অর্জুন যখন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন, তাঁর বৌদ্ধিক প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। শ্রীকৃষ্ণ সেই মুহূর্তে বলেন, কেবল তোমার বৌদ্ধিক প্রবৃত্তি কোনো সুরাহা করবে না তোমার। তোমার প্রয়োজন যোগ, কর্মযোগ।"[৫৫] বিভ্রান্ত ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণের কাছে পথনির্দেশ যাচ্ঞা করেন যাতে তিনি দিব্যজ্ঞানের প্রাপক হয়ে উঠতে পারেন।

এই 'বিভ্রান্তি' বা 'ক্ষত' গান্ধীর আলোচনায় সত্যাগ্রহীর প্রাত্যহিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনকে চিহ্নিত করে। চরকা কাটা এক নিত্যকর্মসূচির গান্ধীসৃষ্ট প্রতীক হয়ে ওঠে, যথার্থ উদ্দীপনার সঙ্গে সেটি পালনের মধ্য দিয়ে সত্যাগ্রহী তাঁর নিজ প্রাত্যহিক আত্ম সম্পর্কে বিস্মৃত হতে পারে। গান্ধীর প্রস্তাব হল, নিঃসন্দেহে ভক্তিধারার রীতিগুলো ব্যবহার করে, চরকার প্রতি সত্যাগ্রহীর নিষ্ঠা হওয়া উচিত এক দাসের মতো। "তোমার অধিকার হল কাজ করা, ফলের প্রত্যাশায় নয়"—দাসপ্রভু এমনই বলেন দাসকে। "মন দিয়ে কাজ কর, কিন্তু বাগান থেকে কোনো ফল তুলতে সাবধান। আমি যা দেবো সেটাই শুধু তোমার।"[৫৬] গান্ধী লেখেন, ঈশ্বর "আমাদের অনুরূপ নিয়ন্ত্রণ বিধিতে বেঁধে রেখেছেন। তিনি আমাদের বলেন, ইচ্ছে হলে আমরা কর্মে লিপ্ত হতে পারি, কিন্তু কাজের পুরস্কার সম্পূর্ণতই ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন।"[৫৭] এই উপমাটি যাতে আমাদের বিভ্রান্ত না করে সেজন্য গান্ধী-নির্দেশিত সীমাবদ্ধতাগুলো মনে রাখতে হবে। "দাস ও দাসমালিকের সম্পর্কটি অস্বাস্থ্যকর, কারণ এটি (মালিকের) স্বার্থনির্ভর।"[৫৮] সত্যাগ্রহী এমন এক ব্যক্তি যিনি স্বার্থের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই চালান। এখানে গান্ধী আবার গীতায় বর্ণিত অর্জুনের *বিশ্বরূপ-দর্শন* প্রসঙ্গ টেনে বলেন : "মানুষ নিয়ত ঈশ্বরের মুখের ভেতর ধাবমান। জ্ঞানীজন সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় ধায় এবং ঈশ্বরকে বলেন যে সে তাঁর দাস হতে চায়, বিশ্বের নয়।"[৫৯] *স্বরাজ* তখনই উপলব্ধ হতে পারতো যখন সত্যাগ্রহীরা প্রত্যেকে তাদের শ্রম পালন করতো কোনোরকম শ্রমের চেতনা ছাড়া।[৬০] এইরূপ নিঃস্বার্থ চেতনার স্তরে কাকেই বা দখল করা যাবে আর কে-ই বা হবে দখলদার? যদি ... আমরা চরকা আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারি, আমরা বিশ্বসেবায় নিয়োজিত হতে পারি, নিজেরা খুশি হতে পারি, এক মহাসংকট থেকে সুরক্ষিত জীবন যাপন করতে পারি, অর্থাৎ আমরা কারো অধীনস্থ হবার ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারি।[৬১] সত্যাগ্রহী যুগপৎভাবে অন্য জগতেও জনকল্যাণ নিশ্চিত করার এক উপায় সুরক্ষিত করেন।[৬২] কিন্তু গুরুতর বিষয় আত্ম-সচেতনামুক্ত হওয়া যাকে মদত জোগায় প্রাত্যহিক অহং, চোখের পাতা যেমন অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় চোখের সুরক্ষা দেয়—অর্থাৎ, কোনো সচেতন উদ্দেশ্য ছাড়া—অনুরূপভাবে সত্যাগ্রহীর সঙ্গে তার লক্ষ্যের সম্পর্ক স্বতঃস্ফূর্ত হবে, যেখানে ফলের কোনো প্রত্যাশা থাকবে না।

চরকা কাটার কৌশল হিসেবে সুবিধা এই যে সামাজিক অবস্থান নিরপেক্ষে এটি সবার কাছে লভ্য। সত্যাগ্রহ কর্ম হিসেবে শুধুমাত্র *উচ্চবর্ণের* মানুষদের জন্যে সীমিত নয়। গীতার অনুপ্রেরণায় গান্ধী বলেন, "মহিলা, *বৈশ্য*, *শূদ্র* সব শ্রেণির মানুষরা স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য।

একইভাবে, আমরা সবাই চরকা কাটতে পারি।" গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে, "আমাদের ইন্দ্রিয় যেন মনকে বিক্ষিপ্ত করে ফেলতে না পারে।" যদি এই স্তরে পৌঁছোনো নিশ্চিত হতে পারে, "আমরা সত্যাগ্রহের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারবো।"[৬৩] গান্ধী পরিষ্কারভাবে বলেন, চরকা কাটা নানা কর্তব্যের মধ্যে একটি কর্ম যার মাধ্যমে সত্যাগ্রহী রাজনীতিকে আলিঙ্গন করে বসবাস করা সত্ত্বেও নিজেকে "রাজনীতি" থেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে।

> আজকাল রাজনীতি বা সামাজিক সংস্কার, সব কিছুতেই আমরা এক শাখা থেকে অন্য শাখায় লাফ দিয়ে চলি। ... আজ যে মানুষ এক লাখ টাকা উপায় করে তৃপ্ত নয় ও পরবর্তী দিনেই সে দশ লাখ উপার্জন করতে চায়, যাকে আজ *মহাত্মা* বলা হয় সে আশা করে বরাবর তাকে তা-ই বলা হবে—এ' ধরনের মানুষদের চিত্ত যে কোনো ভাবনা বা আকর্ষণীয় দুর কল্পনায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তার মন কখনোই স্বচ্ছ সাদা খাদির মতো নয়; সে সব সময়ে তার মনকে অলঙ্কৃত করতে চায়, যেভাবে কেতাদুরস্ত মহিলারা নানা রঙীন শাড়ি আর নক্সাদার পাড় দিয়ে নিজেদের শরীরকে আবৃত রাখে। এই ধরনের মানুষ কখনোই ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত হতে পারে না। একমাত্র চূড়ান্ত বিনীত চিত্তের মানুষ, যে বিশ্বাসী হওয়ায় বিশ্বাস রাখে, সে-ই দৃঢ় ধীশক্তির অধিকারী হয়।[৬৪]

১৯২০-তে ও পরে উভয় ক্ষেত্রেই *সত্যাগ্রহকে* এক প্রহরার কাজ বলে দেখা হয়েছে। এটা ছিল এক কাজ যা সত্যাগ্রহী রাজনৈতিক কর্মীকে শেখায় কীভাবে জাগতিক হওয়া সত্ত্বেও প্রভাবতাড়িত না হয়ে থাকা যায়। এটিই গান্ধী গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে প্রদত্ত বাণী থেকে সংগ্রহ করেন।

> উপসংহারে, শ্রীকৃষ্ণ *স্থিতপ্রজ্ঞের* লক্ষণ একটিমাত্র ছত্রে বলেন। যখন সকল মানব এবং অন্যান্য প্রাণীরা রাত্রে নিদ্রিত থাকে তখন তিনি জাগ্রত থাকেন আর মানবসহ সমস্ত প্রাণীকুল যখন জাগ্রত অবস্থায়, দ্রষ্টা সন্তের তখন রাত্রি। এটিই *সত্যাগ্রহ আশ্রমের* আদর্শ হওয়া উচিত। ... পৃথিবীর রাত্রি আমাদের দিবস আর পৃথিবীর দিবস আমাদের রাত্রি। এভাবেই দুইয়ের মধ্যে অসহযোগ। আমরা যদি *গীতাকে* যথার্থ উপলব্ধি করেই থাকি তবে এটাই আমাদের মনোভাব হওয়া উচিত। এটির অর্থ এই নয় যে আমরা অন্যদের তুলনায় উন্নততর। আমরা সামান্য পুরুষ ও নারী, বিশ্বসিন্ধুতে বিন্দুমাত্র। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস থাকা দরকার, আমরা যখন অন্য তীরে উঠতে সফল হতে পারি, অন্য জগতেও পারবো। এই বিশ্বাস না থাকলে আমরা দাবি করতে পারবো না যে, পৃথিবীর নিশা আমাদের দিবা। যদি আমরা আত্মোপলব্ধি অর্জন করতে সক্ষম হই উপবাস ও চরকা কাটার মাধ্যমে, সেই আত্মোপলব্ধি অবধারিতভাবে স্বরাজ সূচিত করে।[৬৫]

এটা এভাবে দেখা যায় যে, গীতার মধ্য দিয়ে গান্ধী এক নিত্যকর্ম পরম্পরার সন্ধান করেছেন, যার মধ্য দিয়ে সত্যাগ্রহীর গড়নকে পৃথক করা যাবে আধুনিক রাজনৈতিক প্রাণীর থেকে, উভয়ত কল্পনায় ও চর্চায়। এটিকেই, আমরা মনে করেছি, রাজনীতির 'অধ্যাত্মীকরণ'

সংক্রান্ত গান্ধীর ইচ্ছা বলে দাবি করা হয়নি, বরং তাঁর স্বীকৃতি এই মর্মে যে *সত্যাগ্রহী*কে রাজনীতিতে রাজনৈতিক মানুষদের পাশে থেকে কাজ করতে হবে যারা অবিরাম তীব্র ভাবাবেগে ব্যক্তিস্বার্থ বা গোষ্ঠীস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত। গীতা যে এই প্রক্রিয়ায় এক আসক্তির উপাদান—প্রায় এক কবচকুন্ডল বা মাদুলি জাতীয় যা সত্যাগ্রহীকে রাজনীতির বিষময় দিক থেকে সুরক্ষিত রাখবে। এই নিবন্ধে পূর্বে বর্ণিত তথ্যে এই প্রস্তাব রয়েছে যে গান্ধীর অনুগামীরা সক্রিয় জাতীয়তাবাদী উদ্‌যোজনে অংশ নিতেন গীতার কপি সঙ্গে রেখে।

[এই নিবন্ধটি ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় Modern Intellectual History, P 335-353, Cambridge University Press, 2010 গ্রন্থে। সেখানে লেখকেরা লীলা গান্ধী ও সঞ্জয় শেঠকে তাঁদের মতামতের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।]

সূত্রপঞ্জি

১. Dhananjay Keer, *Lokamanya Tilak : Father of Our Freedom Struggle* (Bombay : S. B. Kangutkar, 1959), P. 413-14.

২. তদেব, P. 414.

৩. তদেব, P. 414.

৪. Bradley S. Clough, ''Gandhi, Nonviolence, and the Bhagavat-Gita'', in Stephen J. Rosen, ed. *Holy War : Violence and the Bhagavat Gita* (Hampton, VA : A. Deepak Publishing, 2002), P. 61.

৫. তদেব, P. 61.

৬. আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিকভাবে Ajoy Skaria তাঁর মননশীল নিবন্ধ .''Gandhi's Politics : Liberalism and The Question of The Ashram'' in Saurabh Dube ed. *Enchantments of Modernity : Empire, Nation, Globalization* (Delhi : Routledge, 2009), P. 199-233 এবং পার্থ চ্যাটার্জী তাঁর প্রভাবশালী গ্রন্থ Nationalist Thought and the Colonial World : A Derivative Discourse? (London : Zed, 1986) P. 109-তে যে যুক্তির অবতারণা করেছেন তার কিছু সূত্রের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ভিন্নতা ব্যঞ্জিত করে।

৭. J.T.F. Jordens, ''Gandhi and The *Bhagavadgita*'' in Robert N. Minor ed. *Modern Indian Interpreters of The Bhagavadgita* (Albany, NY : State University of New York Press, 1986) P. 88, 90.

৮. Clough, ''Gandhi'', P. 61.

৯. এই গ্রন্থে Faisal Devji-র প্রবন্ধটি পড়ে কেউ রাজনীতির সঙ্গে গান্ধীর সম্পর্কের পরিবর্তনের সময়কাল নিরূপণ করতে পারেন, যখন চৌরিচৌরার হিংসাত্মক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রচণ্ড হতাশ হয়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলন ফিরিয়ে নেন। এই হতাশার

সূত্রে, আমাদের মতে, তাঁর এই উপলব্ধি হয় যে, যখন সত্যাগ্রহে রাজনীতির সঙ্গে গভীর দায়বদ্ধতার বিষয় সংশ্লিষ্ট, রাজনীতি কিন্তু নির্বিচারে সত্যাগ্রহের তৎপরতায় রূপান্তরিত হতে পারেনি।

১০. এর ওপর দেখা যেতে পারে Eric J. Sharpe, *The Universal Gita : Western Images of the Bhagavatgita–a Bicentenary Survey* (London : Duckworth, 1985) এছাড়াও দেখা যায় এই গ্রন্থে Christopher Bayly-র নিবন্ধটি।

১১. Sharpe, *Universal Gita*, P. 67, 85. গীতার "ধ্রুপদী" ভারতীয় ব্যাখ্যার সহজলভ্য রেফারেন্স হিসেবে দেখা যায় Arvind Sharma-র *The Hindu Gita : Ancient and Classical Interpretations of the Bhagavadgita* (La Salle, II : Open Court, 1986); এবং *Abhinavagupta Gitarthasangraha* (Leiden : E. J. Brill, 1983) গ্রন্থটির তাঁর কৃত অনুবাদ ও ভূমিকা।

১২. Sharpe, *Universal Gita*, P. 71.

১৩. Bal Gangadhar Tilak, Srimad Bhagavadgita-Rahasya or Kama-Yoga Sastra, 2nd Edn. trans. Bhalchandra Sitaram Sukhtankar (Poona : Tilak Bros., 1915), "Author's Preface", XIX, XXV. এছাড়াও দেখা যেতে পারে এই গ্রন্থে Shruti Kapila-র নিবন্ধটি এবং Sanjay Seth-এর "The Critique of Renunciation : Bal Gangadhar Tilak's Hindu Nationalism" in *Postcolonial Studies* (June 2006), P. 137-150.

১৪. Sharpe, *Universal Gita*, P. 82.

১৫. Indulal Yajnik, *Shyamji Krishnavarma : Life and Terms of a Revolutionary* (Bombay : Lakshmi Publication, 1950), P. 261.

১৬. Sharpe, *Universal Gita*, P. 78. Sharpe-এর যুক্তি হল, ১৯০৩ সাল নাগাদ অরবিন্দ এত ভালো বাংলা বা সংস্কৃত জানতেন না এবং এই পাঠ-নির্ভর তাঁর ব্যাখ্যা Annie Besant-এর ব্যাখ্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারে।

১৭. তদেব, P. 79. পুরো বক্তৃতাটি পাওয়া যায় Makarand Paranjape সম্পাদিত The Penguin Aurobindo Reader বইতে (Delhi : Penguin, 1999), P. 18-27.

১৮. P. M. Thomas, 20th Century Indian Interpretations of Bhagavadgita : Tilak, Gandhi & Aurobindo (Delhi : Indian Society for Promoting Christian Knowledge, 1987), P. 81.

১৯. উদাহরণস্বরূপ, শ্রী অরবিন্দের যে নির্বন্ধগুলি দেখা যেতে পারে—"The Core of The Teaching", "Kurukshetra" এবং "Man and The Battle for Life" in Sri Aurobindo, *Essays on The Gita* (Pondicherry : Sri Aurobindo Ashram, 1966) P. 28-34, 35-41, 41-48 এবং এই গ্রন্থে Andrew Sartori-র নিবন্ধ।

২০. Sharpe, *Universal Gita*, P. 81.

২১. তদেব, P. 82.

২২. *Indian Sociologist*, জানুয়ারি ১৯১৩, P. 2.

২৩. *Indian Sociologist*, May 1907, P. 19-এর আগে *Indian Sociologist*-এর November 1905 সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে তিলক ও গোখেল-এর স্পষ্ট পার্থক্য দেখানো হয়েছে, যেখানে তিলককে বলা হয়েছে "অনমনীয় দেশপ্রেমিক" আর গোখেলকে "পেশাদার রাজনীতিবিদ"। এর জন্য দেখা যেতে পারে "The President-Elect of The Indian National Congress : Contrast between Mr. Gokhale and Mr. Tilak", *Indian Sociologist*, 4 Nov. 1905, P. 42-44.

২৪. *Indian Sociologist*, April 1907, P. 20. সংখ্যায় Indulal Yajnik তাঁর *Shyamji Krishnavarma*, 200 শীর্ষক নিবন্ধে Har Dayal-এর নাম করেন ঐ চিঠির লেখক হিসেবে। *Indian Sociologist* পত্রিকায় রাজনৈতিক প্রচারকদের প্রশিক্ষণের জন্য এক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পেশ করা হয়, যার জন্য দেখতে হবে *Indian Sociologist*, June 1907, P. 23-24.

২৫. David Hardiman, *Gandhi in His Times and Ours : The Global Legacy of His Ideas* (London : Hurst and Company, 2003), P. 67-68.

২৬. M. K. Gandhi, *Hind Swaraj and other Writings* ed. Anthony J. Parel (Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1997), letter to Jawarlal Nehru, 5 Oct. 1945, P. 149.

২৭. তদেব, P. 30.

২৮. তদেব, P. 30, editor's note, P. 39.

২৯. Tom Weber, "Gandhi Moves" in Debjani Ganguly and John Docker, eds. *Rethinking Gandhi and Nonviolent Relationality* (London & NY : Routledge, 2007), P. 85.

৩০. তদেব।

৩১. J.T.F. Jordens, "Gandhi and the Bhagavadgita", in Robert Minor ed. *Modern Indian Interpretations of The Bhagavadgita* (Albany : Suny Press, 1986), P. 88; *Collected Works of Mahatma Gandhi* (এরপর উল্লিখিত হবে CWMG নামে) P 55 : 10 Feb 1932-15 June 1932, P. 33.

৩২. Sharpe, *Universal Gita*, P. 90-94, 103-5, 116-17. Arvind Sharma-র *Abhinavagupta Gitarthasangraha* দাবি করে যে, এই কৌশলের পূর্বতন ব্যবহার পাওয়া যায় পূর্ব-ঔপনিবেশিক ভারতীয় ব্যাখ্যান-ঐতিহ্যে।

৩৩. ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে থিয়োসফিস্টরাই যে প্রথম গীতাকে মূলত এক রূপকাশ্রিত পাঠ হিসেবে বিবৃত করেছিল তা প্রতিষ্ঠা পায় Sharpe-এর গবেষণায়। Sharpe, *Universal Gita*, P. 90-94, 103-5, 116-17.

৩৪. *CWMG*, P. 37 : 11 Nov. 1926-1 Jan. 1927, P. 75-76.

৩৫. তদেব, P. 88-89.

৩৬. তদেব, P. 76.

৩৭. *CWMG*, P. 37 : 11 Nov 1926 - 1 Jan 1927, P. 82. সাভারকরের এক জীবনী থেকে লন্ডনে গান্ধী ও সাভারকরের এক সভার তথ্য পাওয়া যায়। এক রোববারের সন্ধ্যায় গান্ধী এলেন ইন্ডিয়া হাউসে যখন সাভারকর চিংড়িমাছ রান্না করছিলেন। গান্ধী চিংড়ি খেতে অরাজী হওয়ায়, সাভারকর বিদ্রুপের ভঙ্গিতে বলেন, "এ'তো শুধু এক সেদ্ধ মাছ ... যখন (আমরা) সেই মানুষদের চাই যারা বৃটিশদের জ্যান্ত চিবিয়ে খেতে তৈরি (*জো আংগ্রেজো কো জিন্দা আউর কাচ্চা চাবা সকে ...*)" Harinath Srivastava, *Five Stormy years : Savarkar in London*, June 1906 - June 1911 (Delhi : Allied Publishers, 1983). P. 28-29.

৩৮. *CWMG*, P. 37 : 11 Nov. 1926 - 1 Jan. 1927, P. 131-2.

৩৯. তদেব, P. 338.

৪০. তদেব, P. 82.

৪১. তদেব, P. 100.

৪২. তদেব।

৪৩. এই শব্দটির ইতিহাস পরীক্ষা-সাপেক্ষ। মারাঠী ঐতিহাসিক স্মৃতিতে শব্দটির অনুরণন শোনা যায় ১৬৪৫-এর শিবাজীর *Hindavi Swaraj* ("হিন্দুদের স্ব-শাসন" যেমনটি A. R. Kulkarni অনুবাদ করেন)। A. R. Kulkarni, *Explorations in Deccan History* (Delhi : Pragati, 2006), P. 60. *Indian Sociologist*, March 1907, P. 11. পত্রিকায় উল্লিখিত এক অ্যাংলো-গুজরাতী পত্রিকা *Hind Svarajya*, যার অস্তিত্ব ছিল গান্ধী *হিন্দ স্বরাজ* লেখার অন্তত দুবছর আগে পর্যন্ত।

৪৪. *CWMG*, P. 37, 11 Nov, 1926 - 1 Jan. 1927, P. 77.

৪৫. তদেব, P. 105.

৪৬. তদেব, P. 86.

৪৭. তদেব।

৪৮. তদেব, P. 86-7.

৪৯. তদেব, P. 125.

৫০. তদেব, P. 116.

৫১. তদেব, P. 117.

৫২. তদেব, P. 118.

৫৩. তদেব, P. 118.

৫৪. তদেব, P. 111.

৫৫. তদেব, P. 112.

৫৬. তদেব, P. 341.

৫৭. তদেব।

৫৮. তদেব।

৫৯. তদেব।

৬০. এই গ্রন্থে দেবজী তাঁর নিবন্ধে এই প্রক্রিয়াকে বাহুল্যবর্জিতভাবে বর্ণনা করেন "বিষয়ীহীন কার্য" হিসেবে।

৬১. *CWMG*, P. 37, 11 Nov. 1926 - 1 Jan, 1927, P. 100.

৬২. তদেব।

৬৩. তদেব, P. 121.

৬৪. তদেব, P. 102.

৬৫. তদেব, P. 122.